মস্থলীর লুপ্ত নদীবক্ষে

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

বাসটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। এটাই নাকি আজাসর গ্রামের বাস স্ট্যান্ড। ঝিমধরা শ্রান্ত বিকেলে থর মভূমির প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি সেটা বোঝা যায়। দুপাশে ধু ধু বালির প্রান্তর। যত দূর চোখ যায় আকন্দ গাছের এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ঝোঁপ ভিন্ন আর কিছু চোখে পড়ছে না। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে ছোটখাট গাছপালার মধ্যে কয়েকটি ঘর বাড়ি। সবারই মাটির দেয়াল আর ঘাসের ছাউনি। বাস স্টান্ডের ওপাশে কুঁড়োঘরের মধ্যে চায়ের দোকন। এমন জায়গাতেও চা পাওয়া য়ায় ? দোকানীর সহৃদয় আপ্যায়নে কেউ চায়ের অর্ডার দিল। ওই কয়েকট মাটির ঘরের সমষ্টির নামই আজাসর । ওখানেই ইস্কুল বাড়ি আছে। থাকার মতো জায়গা পাওয়া যাবে, জলও পাওয়া যাবে। কে এখান থেকে অনেক দূর।

যে যার কস্যাক পিঠে তুলে গ্রামের দিকে হাঁটা দিলাম। পিচের রাস্তা পার করে বালিতে পা রেখে বোঝা গেল হাঁটা সহজ ব্যাপার হবে না। জুতো সমেত পা বসে য াচ্ছে। পাহাড়ে, পবর্তে, জঙ্গলে হাঁটা একরকম আর মভূমির বালিতে হাঁটা অন্য রকম। আমাদের যেতে হবে কম করে হলেও চল্লিশ কিলোমিটারে দূরে তাডানা নামে একটি গ্রামে । থর মভূমির মধ্যে এই গ্রামটি একটি ভ্যালি অথবা উপত্যকার কাছে। এমনিতে থর মস্থলীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠথেকে কমবেশি এক হাজার ফুট। তার ওপর বালির ঢিপি বা ছোট ছোট পাহাড়গুলির উচ্চতা আরও শ'দুয়েক ফুট হবে। যে জায়গাটা এমন বালির ঢিপি দিয়ে ঘেরা বর্ষার অল্পস্বল্প বৃষ্টির জলও চারপাশ থেকে এসে জড়ো হয় মধ্যখানে। সেখানে কুয়ো খুঁড়লে জল মেলে, আর ডীপ টিউবওয়েল হলে তো কথাই নাই। রাস্তায় কে নামের আর একটি গ্রাম আছ। সেটিও বহু যুগ ধরে মপথচারীদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে।

আজ সকালে আমরা ছিলাম বিকানীরে। ভোর ছটায় বাস ধরে এসেছি রামদেবরা নামের একটি ছোটখাট শহরে বিকানীর - জসলমীড়ের বাস রামদেবেরার পাশ দিয়ে চলে যায়। ভেতরে বাস স্ট্যন্ডপর্যন্ত যায় না। আমাদের অনুরোধএবং কুড়ি টাকা টিপ্স দিতে ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিল বাস যেখানে পর্যন্ত গেলে আমাদের সুবিধে হবে। পাঁচলিটার সাইজের খাবার জলের গোটাকয় বোতল নামল, তাঁবু নামল, রান্নাঘরের সরঞ্জাম সমেত বস্তা নামল।

রামদেবরার মন্দির রামদেবজীর নামে উৎসর্গীকৃত। এই তল্লাটের একজন বড় জমিদার ছিলেন, নাম ছিল আজমলজী, তাঁর ছেলে। তীর্থ করতে দ্বারকা গিয়ে অ াজমলজী জানতে পারেন তাঁর ঘরে দ্বারকাধীশ অবতার হয়ে জন্মাবেনভাদ্র মাসের দু তারিখে। ঠিক তাই হল। রামদেবজীর নামে অনেক মিরাকেল কাহিনী প্রচলিত আছে। (আমাদের দেশে কেন সব দেশেই এমন মিরাকেল না দেখাতে পারলে তাকে মহান সাধক হিসাবে গণ্য করা হয় না ।) দুপুর দুপুর রামদেবরা থেকে সব খবর-টবর নিয়ে বাসে করে আমরা আজসার চলে এসেছি। আমাদের সাত জনের দল, তিন জন মহিলা। বেড়ানো ছাড়া কাজও কিছু আছে। দল পাকিয়ে চলতে যা মজা একা একা ভ্রমণে তা পাওয়া যায়না। মিসেস আন্নিনী চিত্রে পেশায় আর্কিটেক্ট, নিজের গরজে আসেন, দেশে দেশে ঘুরে কত রকম আইডিয়া পান। বেশ ভাল অভিজ্ঞ ট্রেকার। সবচেয়ে কনিষ্ঠ অনুরাধা, আমি গেলেই সঙ্গ নেয়। এখনও ছাত্রী, ইতিহাস পড়ে লেডী শ্রীরাম কলেজে। সোনালিকে আমি ডেকে এনেছি। পাঞ্জাবী মেয়ে, সুন্দর স্বাস্থ্য। সজল দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, ভুগোলের লেকচারার। এর একটা কাজ আছে এই অঞ্চলে, কিছু খরচ দেবে ইউনিভার্সিটি। ওর সঙ্গে অ ামি এসেছি, আমার পেছন পেছন অনু, আর আমার আগ্রহে মিসেস চিত্রে আর সোনালী। বাকী দুজন আমাদের ক্লাবেরই কলম এবং পঙ্কজ। এবারে পঙ্কজ আমাদের লীড়ার।

বাসের রাস্তাটা পার হয়ে কালকের চায়ের দোকানটার পাশ দিয়ে দুধারে সারিবন্দি আধশুকনো আকন্দ গাছের মধ্যেদিয়ে এগুলাম। উটের গাড়িটার আগে চলছে জলভর্তি ট্যাঙ্ক, তাঁবুর বস্তা, রান্নার সরঞ্জামের বস্তা ইত্যাদি নিয়ে। দু তিন কিলোমিটারের মধ্যেই আকন্দ গাছের পালা শেষ হয়ে ছোট ছোট তুলো গাছের সারি শু হল। ঝোঁপ ঝোঁপ গাছ, তাতে ভর্তি ছোট্ট ছোট্ট তুলোর বল। অনেকটা বনকুলের সাইজ। যেখানে ঝোঁপগুলো রেয়েছে সেই জায়গাটা সাদা হয়ে আছে। সজল বলল ঃ এই তুলো দিয়ে এ দিককার লোকেরা লেপ তৈরী করে। প্রকৃতির অকৃপণ দান, পয়সা লাগেনা এদের। দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, আধপোড়া মাটির রঙের রাস্তার রেখা ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে চলে গেছে দিগন্ত পার হয়ে। তুলোর গাছের দেখা পাওয়া গেল না আর। কেবল মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ঘাসের চাবড়া, আরধুলো ম াটি। এখনও বালির রাজত্বে আসিনি মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেই দূরে গুম গুম আওয়াজ পাচ্ছিলাম। পোখরানের দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশি হতে সাত আট কিলোমিটার হবে। মিলিটারিদের কামান ছোঁড়ার প্রাকটিশ হয় ওখানে, তারই আওয়াজ আসছে। পোখরানের নাম শুনলে অনেকের আণবিক বোমা পরীক্ষার স্থল হিসাবেই মনে পড়বে। আমার কাছে পোখরানের অন্য একটি বিশেষত্ব আছে। সত্যিজিৎ রায়ের ছবি সোনার কেল্লায় পোখরান স্টেশনে জটায়ু ওরফে সন্তোষ দত্তের উটের পিঠ থেকে নেমে হাত পা ছুঁড়ে একসারসাইজ করার দৃশ্যটি মনে পড়ে।সূর্যাস্ত হয়ে যাবার পর বর্ণময় আকাশপটে সিল্যুট জটায়ুর কোমর সোজা করার কটকট শব্দটা পর্যন্ত আমার মনে আছে।

গরম লাগছে এবার। কে এসে গেল মনে হচ্ছে। দূরে একটাআধটা বড় আকারের ঝোঁপঝাড় দেখা যাচ্ছে, তার মাঝে ভাঙা ঘরের দেওয়াল। কে একটা গ্রাম, পরিত্যক্ত গ্রাম। জলের অভাবে পরিত্যক্ত হয়নি, জল আছে এখনও। একটি গভীর কুয়ো আছে, কাঁটা গাছের ডাল দিয়ে ঢাকা। রাখালবিহীন একদল গ আমাদের প

াশ দিয়ে চলে গেল অজারের দিকে। ওদিকে খুব সম্ভবত খাদ্য আছে, শুকনো ঘাস, গাছপাতা। গর মানেই দুধ, দুধ মানেই ঘি, পনীর, মাখন। রাজস্থানের বিখ্যাত গ াওয়া ঘি আর খোয়া । কিন্তু গ তো উট নয়, তাদের দিনে দুবার জল খেতেই হবে। এত জল কোথায় ?

কে পৌঁছে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি সতের কিলোমিটার নিশ্চয় চলা হয়নি। ছাড়া ছাড়া কয়েকটি বাড়ির দেওয়াল বৃষ্টিহীন রাজ্যে এখনও দাঁড়িয়ে। আশেপাশে আগ াছার মতো কিছু শুকনো কাঠি কাঠি ঝোঁপ আধখাওয়া দেওয়ালগুলোকে ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ছড়িয়েছিটিয়ে গুটি দশ বারো ঘর। হাউইটজার কামান, বে াফোর্স কামান, ১৫৫ মিলিমিটার কামান পরীক্ষার এলাকার মধ্যে পড়ে যাওয়ায় কেকে খালি করিয়েছে। আমাদের চলে যাওয়া উচিতযত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে।

চলে যাবার আগে কুয়োটার ছবি তোলা হল। কিছুটা গিয়ে খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে আর একবার কে গ্রামটা দেখলাম। কল্পনায় দেখা গেল লোকজন, একটা দুটো কেঁকর গাছ, গ বাছুর, জমজমাট। জল, তাও সামান্য একটা কুয়োর জলকে কেন্দ্র করে প্রাণের বিস্তার কেমন ছিল কল্পনার চোখে দেখে নিলাম। গভীর বালির রাজত্ব শু হয়ে গেল। অনু বলল ঃ -এবার সত্যি থর মভূমির বালির রাজ্যে ঢুকলাম। চারিপাশে বালি ছাড়া আর কিছু দেখছি না। বেশ ভয় ভয় করছে। কি আশ্চর্য এখানে কি কিছুই নেই বালি ছাড়া ?
-- আছে, অনেক কিছুই াছে। ডেজার্ট বুশ আছে দুরে দুরে। বহু রকম প্রাণীর হাড় আছে বালির নীচে, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর এইসব। আশেপাশে হরিণ আছে অনেক, চিনকারা, ব্যাকবাক। তারা সব গ্রামে কাছাকাছি থাকে।
পাঁচটা তাঁবু এসেছে, দুজন করে থাকা চলে এমন। টিপেটুপে তিনজনও শোওয়া যায়। এলুমিনিয়ামের ফ্রেমের তাঁবুটপাটপ লাগিয়ে ফেলা হল। পাপ্পু ততক্ষণে কয়েকটা কাঠির ঝোঁপ তুলে এনেছে। বালির মধ্যে নালার মতো গর্ত করে আগুন জ্বালিয়েছে। তার ওপর মস্ত একটা ঢাউস কেটলি বসে গেল, চা হবে। এই গরমে চা ?

বালির মধ্যে তাঁবুর গজাল সব ভসভস করে ঢুকে গেল। পাহাড়ে চড়ার তাঁবু মভূমিতে কি করে খাটানো যাবে ? একটু হাওয়া এলে উড়ে যাবে। তবে মভূমিতে হ াওয়া কোথায়, হাওয়া মানেই তো ধুলোর ঝড়। তাঁবুর মধ্যে বসে জুতো মোজা খুলে ধুলো পরিস্কার করলাম। শরীরেও যথেষ্ট ধুলো, ঝেড়ে নিলেই হবে। আজ থেকে চান নেই, জলের রেশন চালু হয়ে গেছে। কেউ কাউকে রেশনের জল দেবে না।

অলো পড়ে আসছে। গরম ভাবটা কমছে। সজলের হিসাব অনুযায়ী বালি ঠান্ডা হচ্ছে দ্রুত। অপূর্ব পরিবেশ, রান্না করতে বসে গেছে পঙ্কজ আর কমল। সজল বলেছিল আরব দেশের মভূমির বালির সূক্ষ্ম কণা ঊধবাকাশে উঠে যায় এবং পূর্ব দিকে উড়ে আসে। ভারত পাকিস্থানের ওপর পাঁচ থেকে নয় কিলোমিটার উঁচুতে ভেসে থাকে। কণাগুলির ওজন এক মাইত্রণ বা তারও কম হওয়ায় দিনের পর দিন ভেসে থাকতে পারে। তাদের জন্যেই থর আজও মভূমি হয়ে আছে। একদিন এই অঞ্চলটা স্নিগ্ধ শ্যামল নদী অধ্যুসিত আদি মানবের বাসস্থান ছিল। এসব প্রমাণিত সত্য। গুহা মানবের ছোটখাট পাথরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে মভূমিতে। হিমাচল থেকে উৎপন্ন হয়ে হরিয়ানা হয়ে ঘাগর নদী রাজস্থানের গঙ্গানগর থেকে আজকের পাকিস্থানে ঢুকেছিল। সেখানে তার নাম ছিল হাকরা। হাকরা নদী সিন্ধু নদীতে মেশার বদলে ফিরে আসে দক্ষিণ পূর্ব দিকে, এবং লুনি নদীর সঙ্গে মিলে কাচ্ছের রন এলাকায় সাগরে মেশে। এসব বানানো কথা নয়, প্রমাণিত হয়েছে। আমেদাব াদের একটি গবেষণা সংস্থা এই নদীকেই লুপ্ত সরস্বতী নদী বলতে চাইছেন। এই বিশাল ঘাগর নদীটির ধারা বাজস্থানে কোন কোন জায়গায় চার থেকে পাঁচ কিলো মিটার চওড়া ঘাগড় আজও বর্ষার সময় জেগে ওঠে। পোখারান জসলমীড়ের মাঝে কোথাও নদীর ধারা না জানি কত মিটার বালির নীচের চাপে পড়ে গেছে।
বালির ওপর সভা বসেছে। সজল বক্তা, কমল আর অনু শ্রোতা। আমিও বসে পড়লাম। আমি বললাম, ভারতের মভূমি বাড়ছে না কমছে, তোমার কি মত?
সজল বলল, ভারতের মভূমি প্রতি বছর আধ কিলোমিটার করে বাড়ছে, এটা প্রমাণিত। তবে তার মধ্যে কথা আছে। পশ্চিমের হাওয়াতে বালি উড়ে এসে উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলায় আর মধ্যপ্রদেশের কিছু অঞ্চলের ক্ষতি করছে। কিন্তু এসব অঞ্চলে মানুষের বসবাস প্রচুর এবং জলও পাওয়া যায়। তাই কিছু না কিছু চাষ আবাদ হচ্ছে। ফলে মভূমির অগ্রগতি খুব বিরাট আকার ধরতে পারেনি। ইদানিং স্যাটেলাইট থেকে ছবি তুলে দেখা গেছে মোট মভূমির পরিমাণ ঘাটতির দিকে। বিশেষ করে ইন্ডিয়া পাকিস্থান সীমান্ত বরাবর পাকিস্থানের ক্যানের হাকরা, আর ভারতের ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেলের প্রচুর জল এসে যাওয়ায় মস্থলী সবুজ হয়ে অ াসছে।

অন্ধকার নেমে এল, তার সঙ্গে তারা ফুটল আকাশে। একেবারে ঝকঝক করতে লাগল। একটু পরেই স্যান্ডডিউনেরপেছনে চাঁদ ওঠার আয়োজন হচ্ছিল আকাশট াকে লালে লাল করে। যদিও আজ পূর্ণিমা নয়, অর্ধেক চাঁদেরই আলো হল যথেষ্ট । টর্চের দরকার নেই। অন্ধকারে উটটা জবাব কাটছে, কষের দাঁত দিয়ে চিবোব ার কট কট আওয়াজপাচ্ছি পরিস্কার যে যার থালা বাটি চামচ নিয়ে বালির ওপর খেতে বসে গেলাম।

ভোরের দিকে তাঁবু কাপড়ে হাত ঠেকায় ভিজে ভিজে লাগল, ঘুমটা ভেঙে গেল, উঠে গেলাম। সাবধানে তাঁবুর চেন টেনে বাইরে এলাম। বেশ ঠান্ডা, তাঁবুগুলো ভিজে শপর্শপ হয়ে আছে। চুপসে গেছে সব। সজল ঠিকই বলেছিল- সকালে দেখবেন এখন। ভোরের আলো দেখা দিয়েছে ফুব দিকে। রাতে ধ্রুবতারা দেখে উত্তরদিক চেনা গিয়েছিল, এখন ঊষার আলো দেখে পুব দিকটা বোঝা গেল। আকাশে একটি মাত্র তারা দপদপ করছে, একটু পরে সেটাও নিভেযাবে।
আজ আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় থামব। উপত্যকা মত জায়গাটায় জল জমে বর্ষার সময়, গাছপালা আছে যাহোক কিছু। আর আছে লাইম স্টোন অর্থাৎ চুনা পাথরের বিশাল ভান্ডার। অথচ সেখানে গ্রামীণ মানুষ ছাড়া খনি তৈরী করার অসুবিধে। আমাদের মধ্যে একমাত্র সজল দেবই কি জানি কি দেখতে চায় ওখানে জানি না, আর সবাইঘুরতে এসেছি, কেবল দেখতে এসেছি মভূমি কাকে বলে।

মভূমিতে কেঁকর গাছ একটি অদ্ভুত জিনিস। তেঁতুল গাছের মত ঝাঁকড়া, নীচের দিকটা উট যতটা গলা যায় ততটাখেয়ে নেয় তাই মনে হয় কেউ যত্ন করে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিয়েছে নিখুঁতভাবে। গাছটা ঠিক টুপির মতো মনে হয় কান্ডের ওপর বসানো হয়েছে। তলায় তো গোবর, ছাগলনাদি ছানো, সব শুকনো খটখটে। হালক া ওজন, যেন উনুন দিলেই সুন্দর ভাবে জ্বলবে।

আমরা সবাই গাড়ির চাকার দাগ ধরে হাঁটছি। বালির উঁচুনীচু ঢিপি এবং কদাচিৎ একটা আধটা ঝোঁপ ঝাড়। টুকটাক খাবার আছে সঙ্গে আর জতেলর বোতল। চে

াখে পড়ল কাঠির ঝোঁপ। ছাগলে কাঠি খাচ্ছে খটখট করে। চিবোচ্ছে বেশ কটরকটক আওয়াজ করে। বালির ঢিপি বেয়ে একটা লোক নেমে এল। ছাগলদের বাবা হবে, হাতে লাঠি। তিনটে চিতল হরিণ অবাক হয়ে আমাদের দেখছে দূর থেকে। কি ভেবে তারা চলে গেল, হয়তো সকালবেলা ব্রেকফস্ট করতে এসেছিল কাঠির ঝোঁপে। বোঝা গেল ছাগল ভেড়া চরাতে চরাতে পশুপালকরা পনের কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত চলে যায়। এবং ছাগলেরা পৃথিবীর আবরণ শেষ করে দিয়ে প্রচন্ড ক্ষতি করে। পাহাড়ী এলাকায় ভুস্খলন এবং এখানে বৃষ্টির অভাব সৃষ্টি করতে এরা অদ্বিতীয় । এই সব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলাম।
পরিস্কার চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছি, অতএব হারিয়ে যাবার ভয় নেই। রোদ উঠেছে, মুখের চামড়া বাঁচাবার জন্য তোয়ালে চাপা দিলাম মাথায়, তার ওপর হলুদ রঙের পি-ক্যাপ। আমি অনু অগ্নিনী সজল আর সোনালী একসঙ্গে চলেছি, বকবক করতে করতে।

সজলের চোখকে বলিহারি দিতে হয়। একটা বালিয়াড়ি থেকে নামার পর ছোট্ট ছোট্ট শামুকের খোল কুড়িয়ে নিয়ে দেখাল। গোল হয়ে ওকে ঘিরলাম সবাই। সত্যি শামুকের খোল, মেয়েদের গলার মালার পুঁতির মতো। এরা তো জলের জীব, মভূমিতে এল কেমন করে? আরও রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সবাই এক আধটা কুড়িয়ে পেল। বলল, টিপ টিপ সাদা সাদা গুঁড়ি শামুকের খোল একথাই বলছে এখানে জল ছিল, তার মানে এখানে জল আছে, ওপরে না হয়ে নীচে। এক নজর চারিপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সজল বলল ঃ দেখুন মুখার্জীদা, এই জায়গাটার অবস্থান অনেকটা বাটির মতো। বালির ঢিপি চারিদিকে, তিন কিলোমিটার লম্বা ও প্রায় এক কিলোমিটার চওড়া অঞ্চল। পুরো তিন স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় সবচেয়ে নীচু অংশে আমরা শামুকের খোল পেলাম। একটা দুটো কেঁকর গাছও রয়েছে। আমার ধারণা এখানে জল থাকতে পারে যদি ভূ-স্তরের গঠনটা উপযুক্ত হয়। এইরকমই জায়গা একটি আরও আছে, সেটাই আমার গন্তব্য। জায়গাটা তাডানা গ্রাম পেরিয়ে। তাডানা আর ছে-টিববার মাঝে সুবিশাল ভ্যালি, তিন থেকে চার কিলোমিটার চওড়া। যুগ যুগ আগে সত্যি নদী ছিল। গোটা চারেক বোরিং করতে পারলে বোঝা যেত ভূস্তরের গঠন।
বারো কিলোমিটার চলা হল, উটের গাড়িটা অনেক এগিয়ে গেছে। তিন চার কিলোমিটার চলার পর গ্রাম দেখা গেল। ঠিক তখনই তিন মহিলা কণ্ঠে সমবেত উচ্ছসিত চিৎকার শুনলাম ঃ — বিউটিফুল, হাউ নাইস।

গ্রামের দৃশ্য নয়, প্রচুর গ বাছুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাও নয়। বাঁ দিকে দেখলাম সারি সারি বালির ঢিপিগুলোর ওপর নকশা কেটেছে হাওয়া। অদ্ভুত, মনোরম, অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, ঢেউয়ের পর ঢেউ এক ইশারায় কেউ স্ট্যাচু করে দিয়েছে। ফ্রিজ শট।

জসলমীড়ের কাছে একটা ট্যুরিস্ট স্পট আছে, নাম স্যাম ডিউন। সেখানে এইরকম নকশাকাটা বালির ঢিপি দেখতে যায় অনেকে। সেখানকার বালির ঢেউয়ের দিগন্তে সূর্যাস্ত দেখাও একটা অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমরা যা দেখছি তার কাছে স্যাম ডিউন নাবালক শিশুমাত্র।

এখানে কোন টুরিস্ট আসে না, তাই প্রকৃতি অকৃপণ হাতে এঁকেছে বালির ওপর নক্সা। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে বিভিন্ন আকারের ঢিপি অনেকগুলো, তার গায়ে নক্সা নানারকম। কোনটার ঢেউগুলো ঘন। কোনটার নক্সা তারই মধ্যে বড়। একটার নক্সা নীচের দিকটা বেশ বড় বড় হলেও ওপর দিকটা ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। স্যাম ডিউনে যা নেই তা হল ঢিপিগুলোর সামনে প্যারাবোলার মত গর্ত। লাইন দিয়ে সারি সারি পনেরটা এত সুন্দর নক্সা কাটা বালির ঢিপি আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম।

বালি এত সূক্ষ্ম ও হালকা যে সামান্য বাতাস সহজেই আবার গড়ে দিতে পারবে নৈসর্গিক চিত্রকলা। কাছে গিয়ে আমরা সবাই হাত দিয়ে অনুভব করলাম বালির কাজগুলি। রোদ্দুর বাড়ছে, আর দেরী করা উচিত নয়। গ্রামের দিকে এগুলাম। তাডানাতে আমরা দাঁড়াব না, এগিয়ে যাব আরও খানিকটা। ছে টিববা আরও ষোল কিলোমিটার। ছটা জমে যাওয়া বালির পাহাড় পাশাপাশি। তাডানাতে দু-একটা ইঁটের বাড়ি রয়েছে আর আছে ট্রাক্টর। বালির ওপর ট্রাক্টর বেশ ভালই চলতে পারে। বিশাল চাকা অথচ ওজনে কম, জল কাদা, বালি সবেতেই সমান গতি। ট্রাক্টরের সাহায্যে জল এনে ভর্তি করা হয় মস্ত কুয়ো । কুয়ো তো নয়, বাঁধান চৌবাচ্চা। সাধারণত চারকোনা হয় চৌবাচ্চা, সেই আইনে গোল চৌবাচ্চাকে কি বলা যাবে গৌবাচ্চা ?

গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময় অনেক কাচ্চাবাচ্চা ভিড় করে আমাদের দেখতে এল। তাদের পেছন পেছন এল একটা গাইয়ের দল, বাপ আর তার দুই ছেলে। মাথায় বিশাল পাগড়ি গুছিয়ে বেঁথে নিয়ে লোকটা। গাইয়ের নাম ভূতনাথ। বড় ছেলেটার নাম দেও নাথ বছর বারো বয়েস আর ছোটটা জোয়ারনাথ, দশ বছর হবে। লোকটার চারটে ছেলে, সবচেয়ে বড় দুটো গুজরাটে আছে কাজকর্ম করে। ভূতনাথের হাতে একটা একতারা ধরণের যন্ত্র, খোলটা লাউয়ের নয়, কাঠের, অনেকটা ছোট তানপুরার মতো, কেবল দুটো মাত্র তার। বাঁ হাতে দুটা লোহার আংটি, খোলের গায়ে ঠকঠক করে তাল দেবার জন্য। দু ছেলের হাতে দুজোড়া কর্তাল। পরপর চারটে গান করল ওরা। গ্রামীণ গীত, সুর যেমন তেমন, তবু তো আসল লোকগীত।
মে লহড়িয়ো, লহড়িয়ো ম লহড়িয়ো লায়দো
নয়শো পিয়া রোকড়া, মে লহড়িয়ো লায়দো।...

একখানি ভাল শাড়ীর জন্য বায়না ধরেছে মুমল বাই তার বর মেন্দ্রা শাহ্-এর কাছে। প্রত্যেকটি গানের জন্য পাঁচ টাকা করে পেল ভূতনাথ। আমি খুঁটিয়ে দেখলাম ছোট ছেলেটার মুখশ্রী। কাল পাথর কেটে তৈরী কচি সুন্দর মুখটা। সজল বলল ঃ থর মভূমিতে জনসংখ্যা বেশ ভালই। সাহারাতে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র তিনজন বাস করে। থরে সেই জায়গায় গড়ে একশ তেইশ জন বাস করে। এই মস্থলীতে অবশ্য কম, গড়ে একশট্টি জন।
—মস্থলী কথাটা কবারই শুনলাম। ওটার কি আলাদা অর্থ আছে ?
—মাড়োয়ার অথে মরবার, অর্থাৎ মরে যাবার জায়গা। দক্ষিণ পশ্চিম রাজস্থান মভূমির সবেচেয়ে খারাপ অংশ। মস্থলী বলতে সাধারণত এই জায়গাটিকে বোঝায়। আমরা সেখান দিয়েই যাচ্ছি এখন।

ছে টিববার দিকে বালি ভর্তি প্রান্তরে দাগের ওপরে দিয়ে চলেছি, রোদ্দুর ভালরকম কষ্ট দিচ্ছে। সোনালী বেশ ফর্সা মেয়ে, লাল হয়ে উঠেছে একেবারে। দেরী করাটা একদম উচিত হয়নি। কিন্তু আশেপাশের দিকে নজর না দিয়ে, চোখ মুখ বন্ধ রেখে তো আমরা চলতে আসিনি। তাহলে বাড়িতে বসে থাকলেই তো হত। মিসেস চিত্রে যা বলছিল হিন্দিতে তার বাংলা করলে এইরকম হবে।

---রাজস্থানে মেয়ে হয়ে জন্মানো খুব দুর্ভাগ্যের। পুরোন দিনের কথা নয়, আজও প্রায় একরকম অবস্থা রয়েছে। রূপ কুনওয়ারকে সতী হতে প্ররোচনা দিয়েছিল এরাই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে হত্যা করে বালি চাপা দিয়ে আসে এরাই। আবার মেয়ে না হলেও চলে না, টি বানাবে কে, দূর দুর থেকে জল বয়ে আনবে কে। অন্য প্রয়োজনের কথা না হয় বাদই দিলাম। ঠাকুর আর রাণাদের রাজত্বে মেয়েদের কঠোর পর্দা প্রথা মানতে হত। এক এক জনের আটটা দশটা করে বিবি ছিল, আর ছিল বেশ কয়েকেজন রক্ষিতা।

আমরা কেউ প্রতিবাদ করলাম না, এক রকম মেনেই নিলাম। সোনালী বলল ঃ ছোড়ো জি ইয়ে সব বাত। জায়গাটা কিরকম যেন, না আছে বালির উঁচুনীচু ঢিপি, না আছে শক্তপোক্ত মাটি। হালকা ঝুরঝুর ধুলোর মতো বালি সুবিশাল ময়দান। যেদিক থেকে এলাম সেই তাডানার লাইম স্টোনের ঢিলার চিহ্ দেখা যায় না। সামনে অনেক দূরে মনে হয় উঁচু নীচু কিছু রয়েছে। আন্দাজ পাঁচ কিলোমিটার সমতল জমি। সজল বলে উঠল ঃ এটাই লুপ্ত সরস্বতীর খাদ মনে করা হচ্ছে, মুখার্জীদা।

চমকে উঠলাম। কি আশ্চর্য, সত্যি মনে হয় না যে, সজল ম্যাপ খুলে দেখাল, হাতে করে সম্ভাবিত লুপ্ত সরস্বতীর গতিপথ এঁকে এনেছে। ম্যাপটা জিওলজিক্যাল স ার্ভে অব ইন্ডিয়ার, তাতে উত্তর রাজস্থানের ঘাগর নদী থেকে পাকিস্তানের ভেতর হাকরা নদী হয়ে দক্ষিণ রাজস্থানের লুনী নদী পর্যন্ত পুরো মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি ঠিক হয়, মানেআমেদাবাদের রিসার্চ গ্রুপের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে আমরা এখন নদীগর্ভে রয়েছি। জায়গাটার ভৌগলিক অবস্থান সেই রকমই ইঙ্গিত করছে। এখান থেকে জসলমীড় বাঁ দিকে চল্লিশ কিলোমিটার, সামনে পাকিস্তানবর্ডারও প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। এই জায়গাটা দেখতেই আসা। থাকব এখ ানে আমরা পুরো একটা দিন। তারপরছে টিবিব পার করে চলে যাব তানোট বর্ডার পর্যন্ত। ওটাই আমাদের গন্তব্যস্থল। মাঝে একটা জায়গা পাব মোহনগড়, সেখানে জল ভর্তি করা হবে ট্যাঙ্কে।

তানোট পর্যন্ত একইরকম ক্ষ শুষ্ক মাড়ওয়ার মস্থল পাওয়া যাবে। নিজের চোখে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না কার নাম থর মভূমি। পাকিস্থান বর্ডার তানোট থেকে কিছু দূরে। ওখানেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি অংশ ঘটেছিল।

আমরা সত্যই কি সরস্বতী নদী বক্ষে রয়েছি। বেদে উল্লিখিত নদীটা গঙ্গা নদীর চেয়েও বিশাল ছিল, তার এমন কিহল সেটা লুপ্ত হয়ে গেল। আসবার সময় ট্রেনে সজল আমাদের যত্ন করে বুঝিয়েছে নদী লুপ্ত হয়নি। অত বড় নদী নিখোঁজ হবে কি করে? ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে যমুনা তিন বার নিজের জায়গা থেকে সরে এসেছে পশ্চিম দিকে। কারণ আর কিছুই নয়, ভূমিকম্প। আবার ভূমিকম্পও কারণ নয় সিম্পটম। আরাবল্লী পর্বতমালা রাজস্থানের পূর্ব দিকে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত। সেটাই আরও উত্তরে বাড়বার চেষ্টা করেছিল কোন সময়। দিল্লী থেকে হরিদ্বারপর্যন্ত একটা পাহাড় তৈরী হল, কালে সেটা মাটির নীচে চাপা পড়ল। যমুনাকে পশ্চিম দিকে সরতে হল। এই প্রক্রিয়ায় তিন বারের বার যমুনা গ্রাস করল সরস্বতীর জায়গাটা। যমুনা আর সরস্বতীর বিলয় হয়ে গেল। আর সরস্বতীর জলধারা ? সেটা হিমাচল প্রদেশের থেকে হরিয়ানা হয়ে ঘাগর নাম দিয়ে রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলার অনুপগড়েরকাছে পাকিস্থানে ঢুকে গেল, সেখানে নাম হল হ াকরা। হাকরা বেশ বড় নদী, শতদ্রু নদীর মতো সিন্ধু নদীতে না পড়ে ফিরে এল আবার রাজস্থানে। বলা হচ্ছে যে সেই হাকরা নদীই মোহনগড়ের কাছ দিয়ে এসে লুনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল পচভদ্রের কাছে। ওখানে এখনও একটি শাখানদীর নাম সরস্বতী। আসলে লুনী ছিল হাকরা নদীর শাখা নদী। এই জায়গায় যে একটা বিশাল নদী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা না হলে কচ্ছের রণের মতো অত বড়মোহনার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই মিলে আবার ম্যাপ দেখতে লাগলাম। এতবড় নদী যখন আগে ছিল তখন তার চিহ্ তো কিছু এখনও পাওয়া যাবে। ধরা যাক তিন হাজার বছর আগে ছিল নদীটা, সব চিহ্ই কি লুকিয়ে পড়েছে বালির নীচে ? মনে হয় না। বললাম, - এটাই, যদি নদীর ড্রাইবেড হয়, তাহলে এখানে ড্রিল করলেপাললিক ধরণের মাটি বা পাথর পাওয়া যাবে।

---ঠিক তাই। ভৌগলিক চিহ্গুলি তাই বলে। মনে কন আমাদের সামনে সিন্ধু নদী আর পিছনে আরাবল্লী পর্বত উঁচু হচ্ছে ধীরে ধীরে। তাহলে এখানে খুঁড়লে জল প াবেন না। জল গড়িয়ে চলে গেছে পশ্চিমে। ঠিক সেই কারণে থর মভূমির পশ্চিম দিকটায় জল পাওয়া যায়। ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেলটাও ওই দিকে।

আরামে চোখ বুঁজে কল্পনা করতে দোষ কি যে আজ থেকে তিন চার হাজার বছর আগে আমার ওপর দিয়ে একটা গভীর খরস্রোতা নদী বইত। অমি যেখানে কস্য াকের ওপর মাথা রেখে পা ছড়িয়ে বসেছি তার ওপর আর চারিপাশে গভীর জল। কত ছোট বড় মাছেরা খেলা করছে। নদীর বুকে কাঠের তৈরী বিরাট ষোল দঁ াড়ের পালতোলা নৌকো চলেছে বাণিজ্য । গুজরাটের রণের মধ্য দিয়ে আরব সাগরে পৌঁছে যাবে। তারপর সমুদ্র পার হয়ে যাবে হয়তো মিশর অথবা মেসে াপটেমিয়া।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com